ইউনিট ১ চারুকলা (তত্ত্বীয়)

ভূমিকা

চারুকলার বিভিন্ন দিকগুলো এই পাঠে আলোকপাত করা হয়েছে। চারুকলা কি এবং কেন এর প্রয়োজন? চারুকলার সাথে জীবনের সম্পর্ক, অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্ক এবং এর ব্যবহার কি রকম হওয়া প্রয়োজন? চারুকলার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে।

অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ে যেমন চারুকলার প্রয়োজন তদ্রুপ চারুকলা পাঠেও এর ব্যবহার রয়েছে। সে দিকে নজর দিয়ে বেশ কিছু ছবি, আলোকচিত্র ও ড্রইং সংযোজন করা হয়েছে। যাতে শিক্ষার্থীদের অতি সহজেই এই পাঠ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। এছাড়া গুহা চিত্র, ইউরোপীয় বিখ্যাত শিল্পী ও বাংলাদেশের শিল্পীদের পরিচিতি মূলক সংক্ষিপ্ত রচনা দেয়া হয়েছে।

আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে চারটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ১.১: চারুকলার সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ

পাঠ- ১.২: চারুকলার প্রকৃতি

পাঠ- ১.৩: আদিম মানুষের আঁকা গুহার ছবি

পাঠ- ১.৪: ইউরোপ ও বাংলাদেশের কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর পরিচিতি

পাঠ ১.১

চারুকলার সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ❑ চারুকলা বলতে কি বোঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- ❑ চারুকলার শ্রেণী বিভাগ করতে পারবেন।

সংজ্ঞা

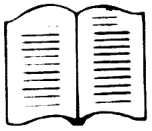

আমাদের জীবনে এমন কতগুলো বিষয় আছে যা মনের খোরাক বা আনন্দ জুগিয়ে থাকে। এগুলো আমাদের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে জাগিয়ে তোলে, কল্পনাবোধকে সঞ্চারিত করে, সৌন্দর্যবোধকে প্রসারিত করে এবং নান্দনিক অনুভূতিকে জাগরিত করার মধ্য দিয়ে মানসিক প্রয়োজন মেটায়, তাকে চারুকলা বলে।

শ্রেণী বিভাগ

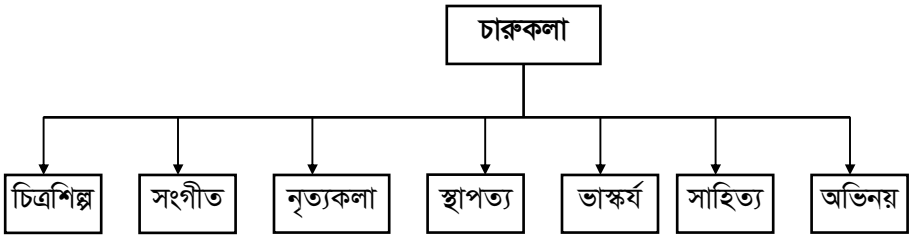

চারুকলার শ্রেণী বিভাগ

১. চিত্রকলা : কতগুলো রেখার সমন্বয়ে, রং তুলির ব্যবহারে যে আবেগ-অনুভূতি, ভাব-উচ্ছাস সৃষ্টি হয় তাকে চিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত করাকে চিত্রকলা বলা হয়।

২. সংগীতকলা : যে কলা মানব মনে সুরের মাধ্যমে আনন্দ ও অনুভূতির উদ্রেক করে, তাকে সংগীতকলা বলে।

৩. নৃত্যকলা : যে কলা অঙ্গের নানারূপ ভঙ্গীমায় সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে দর্শকের মনে অপরিসীম আনন্দের খোরাক যোগায় তাকে নৃত্যকলা বলে।

৪. সাহিত্যকলা : মনের ভাব, আবেগ ও কল্পনাকে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, কাব্য প্রভৃতি লেখার মাধ্যমে মানুষের মনে সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি করে এবং ছন্দ, রূপ ও শব্দ বিন্যাস দ্বারা মনে অফুরন্ত আনন্দ সৃষ্টি করে, তাকে সাহিত্যকলা বলে।

৫. স্থাপত্যকলা : ইট, সুরকি, বালি, মাটি, পাথর, ইস্তাত প্রভৃতি দিয়ে বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা-ইমারত নির্মাণের সু-কৌশলকে স্থাপত্যকলা বলে। স্থাপত্যকলা দর্শকের মনে এক বিস্ময়কর সৌন্দর্য অনুভূতি জাগায়। যেমন- 'তাজমহল'।

৬. ভাস্কর্যকলা : প্রস্তর, কাঠ, মাটি, সিমেন্ট ইত্যাদি উপকরণের সাহায্যে খোদাই বা রিলিফ বা চারমাত্রিক উন্নতমানের শিল্প সৃষ্টি করে যা দর্শকের মনে আনন্দ-ভাব-বেদনা-উচ্ছ্বাস আনে, তাকে ভাস্কর্যকলা বলে।

৭. অভিনয়কলা : যে কলা বিষয়বস্তুকে কথাবার্তা ও অংগ-ভঙ্গীর মাধ্যমে মানুষের মনে রেখাপাত করে, সুনিপুণভাবে ভাব-আবেগ-উচ্ছাস প্রকাশ করে, তাকে অভিনয়কলা বলে। যেমন- নাটক, যাত্রা, আবৃত্তি ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. চারুকলাকে সাধারণত কতভাগে ভাগ করা যায়?
   ক. তিন
   খ. দুই
   গ. সাত
   ঘ. নয়।

২. যে কলা মানব মনে সুরের মাধ্যমে আনন্দ ও অনুভূতির উদ্রেক করে তাকে বলে-
   ক. অভিনয়
   খ. সাহিত্য
   গ. সঙ্গীত
   ঘ. নৃত্য।

৩. 'তাজমহল'কে উৎকৃষ্ট কি কলা বলা যায়?
   ক. ভাস্কর্য
   খ. স্থাপত্য
   গ. চিত্রকলা
   ঘ. কারুকলা।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. চারুকলার সংজ্ঞা বলতে কি বোঝায়?
২. চারুকলাকে কতভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ লিখুন।

পাঠ ১.২ চারুকলার প্রকৃতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের ঋতু কত প্রকার ও কি কি তা বলতে পারবেন;
- প্রত্যেক ঋতুর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা দিতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন ঋতুর ছবির পরিচিতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রকৃতি

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। গাছ-পালা, নদ-নদী, গ্রাম-গঞ্জ, হাওর-বাওর এবং জন-জীবনের সাথে আমরা সবাই পরিচিত। এই সাথে ছয় ঋতুর ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য কমবেশি প্রত্যেককেই নাড়া দেয়। চারুকলার প্রকৃতি বিশেষভাবে শিল্পীকে আন্দোলিত করে। একটু লক্ষ্য করলেই প্রতিটি ঋতুর বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। প্রকৃতি থেকে প্রতিটি মানুষের যেমন শেখার আছে, তেমনি শিল্পীরও। প্রকৃতি শিল্পীর প্রধান শিক্ষক।

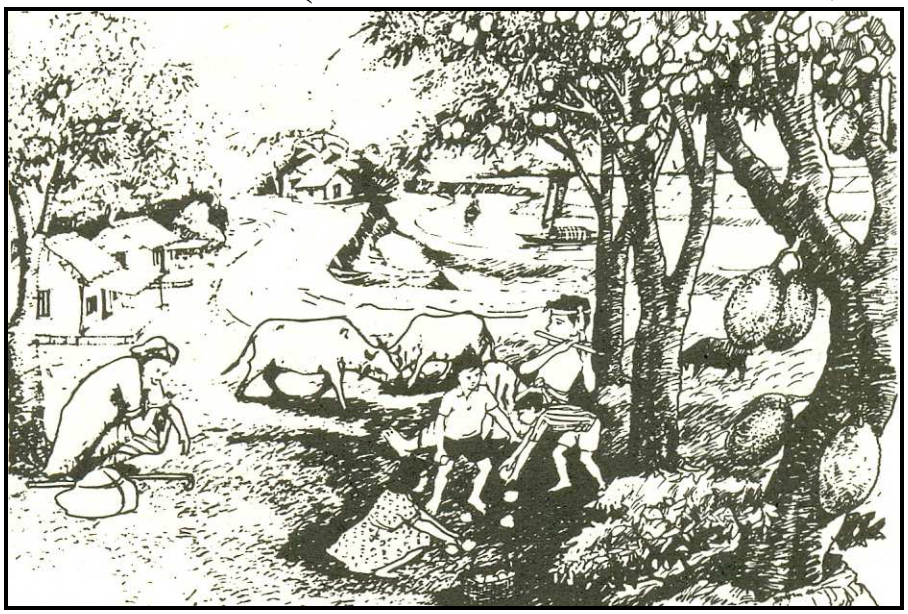

চিত্র ১: গ্রীষ্মকালের ছবি (সাদা কালো)

চারুকলায় প্রকৃতি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। প্রাক-ঐতিহাসিক থেকে অদ্যাবধি ছয় ঋতুর বাংলাদেশে প্রকৃতি কেমন রূপ ধারণ করে, চারুকলায় প্রকৃতির প্রভাব, প্রকৃতি থেকে চারুকলার বিষয়বস্তু নির্বাচন ইত্যাদি প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর চারুকলার ভিন্নতা প্রভৃতি এই ঋতুর উপর ক্রমানুসারে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হল:

গ্রীষ্মকাল

গ্রীষ্মের আগমনে সূর্যের প্রখর তাপে প্রকৃতি হয়ে উঠে অস্থির। ক্লান্ত দুপুরে পথিক বিশ্রাম নেয়। গাছের ছায়ায় রাখাল বাঁশী বাজায়। আম, জাম, কাঠাল, তরমুজ,

লিচুর মৌসুম। ছেলে-মেয়েরা আনন্দে আম কুড়ায়। গাছে গাছে পলাশ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়ার সমারোহ দেখা যায়। নদী-নালা খাল বিল, মাঠ-ঘাট থাকে শুকনো। গুমোট বাঁধা গরম। ধূলি বালির ঝড় এবং প্রতিক্ষিত বৃষ্টি। কালবৈশাখীর ঝড় প্রকৃতিকে ওলট-পালট করে দেয়। ঘর-বাড়ি নষ্ট হয়। পশু-পাখী মারা যায়। প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের জীবনের ক্ষতি হয়। চারুকলায় গ্রীষ্মকাল বিশেষ প্রভাব ফেলে। চিত্র শিল্পীকে করে তোলে অস্থির ও আবেগময়। ছবি আঁকার প্রেরণা জোগায় প্রকৃতি।

বর্ষাকাল

প্রকৃতির অস্থিরতা কাটে প্রতিক্ষিত বৃষ্টির আগমনে। কেটে যায় গ্রীষ্মকাল। আগমন ঘটে বর্ষাকালের। শান্ত স্নিগ্ধ হয়ে উঠে পৃথিবী। নদী-নালা, খাল-বিল, মাঠ-ঘাট ভরে উঠে থৈ থৈ পানিতে। রিমঝিম বৃষ্টির ধারায় উদাস করে মন। কদম, কেয়া, জুঁই, মালতী ফুলের সমারোহ। পদ্মা, মেঘনা, যমুনায় স্রোতের ধ্বনি। পাল তুলে ছুটে চলে নৌকা। মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, ঘর-বাড়ি একাকার হয়ে যায়। চারিদিকে পানি আর পানি। গ্রামগুলো ভাসমান মনে হয়। ইলিশ মাছ ধরার জন্য ছুটে চলে ডিঙ্গি নৌকা। চাষীরাও থাকে ব্যস্ত গৃহস্থালীর কাজে। এমনি অনেক বিষয়বস্তু চারুকলায় আসে বর্ষাকালের প্রকৃতির মাঝ দিয়ে।

চিত্র ২: বর্ষাকালের ছবি (সাদা কালো)

শরৎকাল

মেঘ শূন্য নির্মল আকাশ নিয়ে আসে শরৎকাল। বর্ষার মেঘের খেলার পর সোনালী রোদের ঝলকানি নিয়ে শরৎ সবুজরূপ ধারণ করে। শরতের স্নিগ্ধরূপ আর ফুলের সমারোহে মন আনন্দে ভরে উঠে। খন্ড খন্ড সাদা মেঘের ভেলা আকাশের গায়ে পাল উড়িয়ে ভেসে বেড়ায়। মাঝে মাঝে রংধনুর সাত রঙের আসর বসায়। অবাক দৃষ্টিতে তাকায় শিল্পী। নদী-নালা, খাল-বিলের নিটোল পানিতে স্বচ্ছ সবুজ গ্রাম বাংলার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে। নদীর তীরে তীরে কাঁশ ফুলেরা সাদা মেঘের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রচনা করে। পাখিরা বিচরণ করে আপন মনে। শিউলী ফুলে ছেয়ে থাকে গাছের তলা। ফুল কুড়ায় ছেলে মেয়েরা। মালা গাঁথে মনের আনন্দে। সারদীয় দুর্গা পূজা এই শরৎকালেই।

কাঁচা-পাকা ধান ক্ষেতে বাতাস দোলা খায়। কৃষক কৃষাণী স্বপ্নের নীড় রচনা করে। কবি সাহিত্যিকরা রচনা করেন নানা কবিতা, গান, উপাখ্যান। চিত্র শিল্পীদের মনেও প্রভাব পড়ে শরৎকালের উপর। শরৎকালের মনোমুগ্ধকর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে শিল্পী অনুশীলনে নেমে পড়ে এবং ফুটিয়ে তোলে কাগজে ক্যানভাসে তার অপরূপ সৌন্দর্য। এসব প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদেরও চোখ কেড়ে নেয়।

চিত্র ৩: শরৎকালের ছবি (সাদা কালো)

হেমন্তকাল

প্রকৃতিতে হেমন্তের প্রভাব স্বল্প সময়ের জন্য হলেও তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ফসল তোলার ধুম পড়ে যায়। পাকা ধানের গন্ধে মন মৌ মৌ করে। শুরু হয় নবান্ন উৎসব।শীতের আমেজ বয়ে আনে আরেক সুখানুভূতি।কৃষক-কৃষাণীর চোখে-মুখে হাসির জোয়ার। খেজুর রসে মিষ্টি মুখ আর পিঠা-পুলির স্বাদে মাতিয়ে রাখে মন। ধান কাটা, ধান বোঝাই নৌকা, কৃষকের মাথায় ধানের বোঝা, ধান মাড়াই, ঢেঁকিতে ধান ভানা ইত্যাদি শিল্পীকে আকৃষ্ট করে।

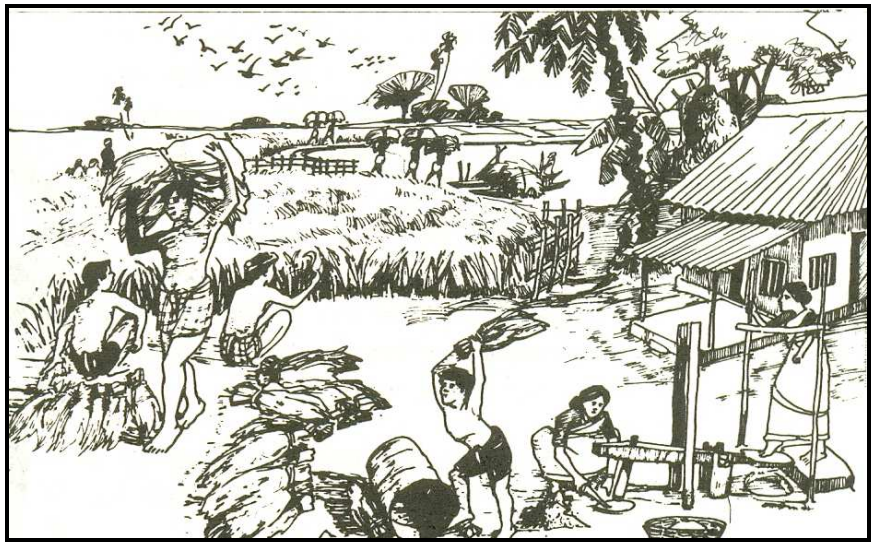

চিত্র ৪: হেমন্তকালের ছবি (সাদা কালো)

শীতকাল

সকাল-সন্ধ্যা শিশির পড়ার মাঝ দিয়েই শীতকাল শুরু। মেঘহীন আকাশ। গাছ-পালা শুকনো, কুয়াশা ভরা প্রকৃতি। শীতে নদীতে হাটু জল। গুণ টানা নৌকা চলে। খালে-বিলে পানি কম, মাছ ধরার মৌসুম। শীতকালে অনেক রকম ফুল ফোঁটে। মোরগ, জবা, ডালিয়া আরো অনেক। ডালিয়ার লাল-হলুদ রঙে আলোকিত রাখে অঙ্গন। শিউলী ফুল ভরে দেয় আঙ্গিনা। সর্ষের হলুদ ফুলে ফুলে ভরে উঠে মাঠ। অপরূপ তার দৃশ্য। শিল্পীরা বিস্ময় নয়নে শীতের প্রকৃতিকে অনুভবে আনে। তাই শিল্পীরা নদীতে গুনটানা নৌকা, পোলো দিয়ে মাছ ধরা, ডালিয়া ফুলের দৃশ্য, সর্ষে ফুলের মাঠ ইত্যাদি বিষয়বস্তু নিয়ে মনের আনন্দে ছবি আঁকে।

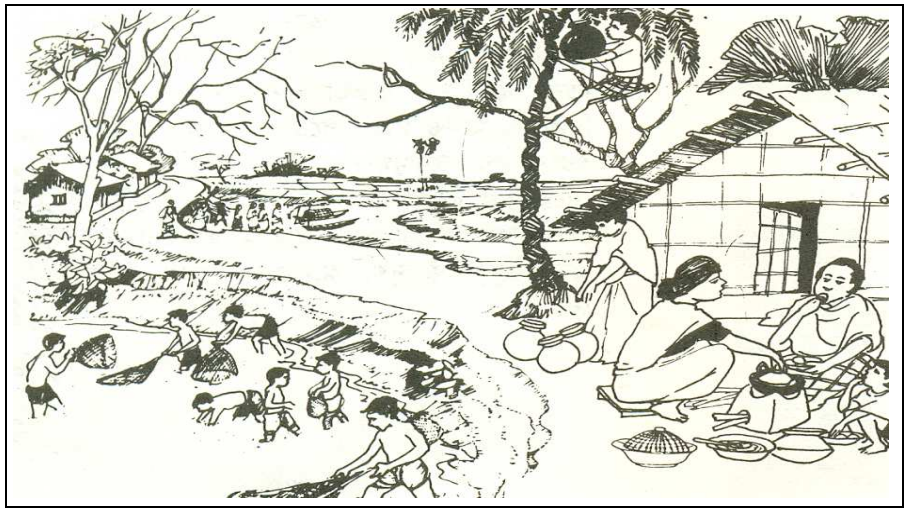

চিত্র ৫: শীতকালের ছবি (সাদা কালো)

বসন্তকাল

বসন্তকে ঋতুরাজ বলা হয়। শীতের পরই বসন্তের আগমন। বসন্তে প্রকৃতিতে নতুন প্রাণ পায়। শীতের পাতা ঝড়া ডালে ডালে নতুন পাতায় ভরে উঠে গাছ-পালা।ফুলে ফুলে ভরে যায় চারদিক। কোকিলের কুহ তানে ভরে উঠে মন-প্রাণ। প্রকৃতি যেন নবযৌবন প্রাপ্ত হয়। অশোক, পলাশ আর কৃষ্ণচূড়ায় ভরে যায় বৃক্ষরাজি।কৃষ্ণচূড়া লাল আবির মেখে নয়ন কেড়ে নেয় পথিকের। প্রকৃতি এই বিশাল চঞ্চলতায় মাতিয়ে রাখে সব প্রাণীকুলকে। উন্মুখ বাসনায় বিচলিত বসন্ত।

বিভিন্ন ফুলের দৃশ্য, মেঠো পথে কৃষ্ণচূড়া, ফুল ও পাখির দৃশ্য, বসনন্ত উৎসবের দৃশ্য ইত্যাদি চিত্র শিল্পীদের আঁকার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

চিত্র ৬: বসন্তকালের ছবি (সাদা কালো)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. বাংলাদেশের ঋতুর সংখ্যা কত?
   ক. চার
   খ. তিন
   গ. নয়
   ঘ. ছয়।

২. ঋতুর রাজা বলা হয় কাকে?
   ক. গ্রীষ্ম
   খ. হেমন্ত
   গ. বসন্ত
   ঘ. শীত।

৩. রং ধনুর রঙ কত প্রকার?
   ক. তিন
   খ. সাত
   গ. চার
   ঘ. ছয়।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রকৃতির বর্ণনা করুন।
২. চারুকলায় ঋতুর প্রভাব বিভাবে আসে?
৩. আপনার প্রিয় ঋতুর ছবি আঁকুন।

পাঠ ১.৩ আদিম মানুষের আঁকা গুহার ছবি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আদিম মানুষের আঁকা গুহাচিত্রের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- সর্বপ্রথম গুহাচিত্র আবিষ্কারের মজার কাহিনী বলতে পারবেন এবং
- গুহাচিত্র আঁকার পরিবেশ, বিষয়বস্তু ও উপকরণের বর্ণনা দিতে পারবেন।

গুহাচিত্র

আদিম যুগের মানুষ ঘর-বাড়ি বানাতে জানতো না। তাই তারা গুহায় বাস করতো। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে স্তেনের আলতামিরা নামে এক গুহার সন্ধান পাওয়া যায়। সেই গুহায় কোন এককালে আদিম মানুষেরা বাস করতো। ঐ এলাকার জমিদার এক দিন বেরুলেন গুহার ভেতরটা খুঁজে দেখবেন আদিম যুগের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় কিনা। সঙ্গে গেল তার পাঁচ বৎসরের মেয়ে। বাবার সাথে বেড়িয়ে আসবে বলে। এই ছোট্ট মেয়েই প্রথম আবিস্কার করে গুহাচিত্রের। জমিদার তার লোকজন দিয়ে গুহার মেঝে খুঁড়ে কিছু হাড়-গোড়, জিনিসপত্র পাওয়া যায় কিনা খুঁজলেন। মেয়েটি মোমবাতি হাতে গুহার এদিক-ওদিক ঘুরে দেখছে। হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠলো- "বাবা ষাঁড়! বাবা ষাঁড়! বিরাট ষাঁড়!" দেখা গেল গুহার দেয়ালে আদিম মানুষের আঁকা ষাঁড়ের ছবি।

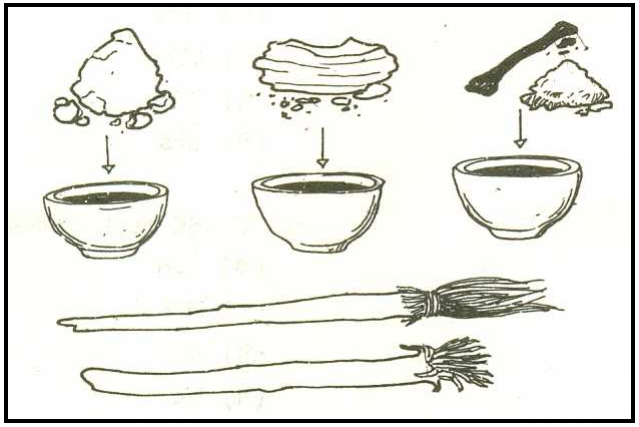

চিত্র ৭: গুহাচিত্রের উপকরণের ছবি (সাদা কালো)

এরপর ফ্রান্সে, আফ্রিকায় অনেকগুলো গুহার খোঁজ পাওয়া গেল। আফ্রিকার গুহাচিত্রের এই আবিষ্কারও তিনটি বালকের। বালক তিনটি পাহাড়ে ঘুরতে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে পোষা কুকুর ছিল। হঠাৎ কুকুরটি হারিয়ে যায়। কুকুর খুঁজতে খুঁজতে তারা এসে পৌঁছে পুরানো এক গুহার সামনে। ভাবলো ভেতরে হয়তো কুকুরটি লুকিয়ে আছে। ভেতরে ঢুকেই তারা দেখতে পেল গুহার গায়ে ছবি আঁকা। যা কিনা আদিম মানুষেরা এঁকেছিল।

এমনি করে এতগুলো গুহা আবিষ্কারের পর আদিম মানুষের ছবি আঁকা সম্পর্কে আর কারো দ্বিমত রইল না। পন্ডিতেরা হিসেব করে বলেছেন পুরানো প্রস্তর যুগের শেষ ভাগে আদিম মানুষেরা এইসব ছবি এঁকেছিল। এসব গুহা চিত্রের বয়স খৃষ্টপূর্ব দশ হাজার বছর থেকে ত্রিশ হাজার বছর পর্যন্ত।

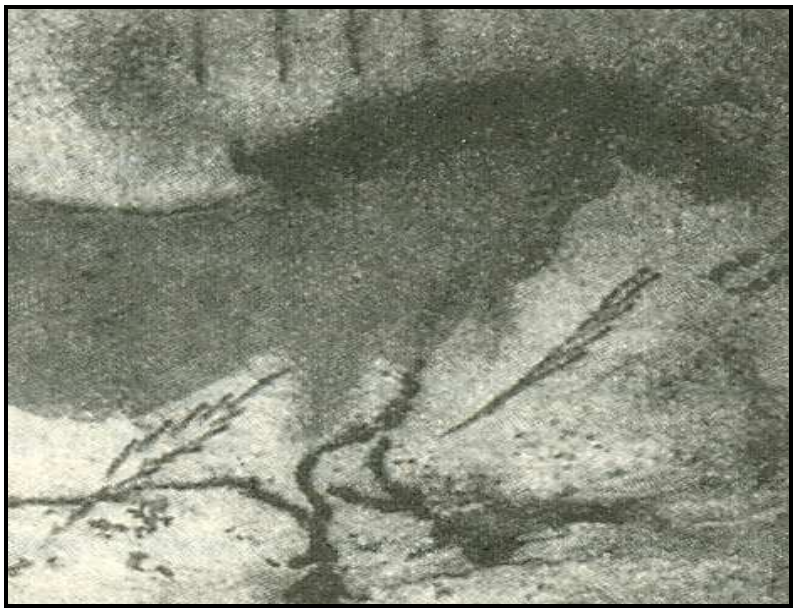

চিত্র ৮: গুহাচিত্রের ছবি (সাদা কালো)
(রঙিন নমুনা চিত্র পরিশিষ্ট 'ক' তে দ্রষ্টব্য)

আদিম মানুষেরা ছবি আকার জন্য বর্তমান যুগের মতো রঙ তুলি পেত না। তারা ছবিতে রঙ লাগাত নিজেদের তৈরি রঙ দিয়ে। লাল মাটি, হলুদ মাটি, পশুর চর্বির সাথে মিশিয়ে রঙ তৈরি করতো। কাল রঙ তৈরি করতো পশুর হাড় পুড়িয়ে। মোটামুটি তিনটি রঙ দিয়েই তারা গুহাচিত্র করেছে। পশুর নরম লোম দিয়ে তুলি তৈরি করতো কিংবা গাছের ডাল চিবিয়ে বা থ্যাবড়া করে নিয়ে তা দিয়েই ছবিতে রঙ লাগাতো। পশুর হাড় কেটে বা চোখা করে পাথরের গায়ে আঁচড় কেটে ড্রইং করতো। যে উপায়ে ও যে সব উপকরণের সাহায্যেই গুহা চিত্র আঁকা হোক না কেন; তারা নিখুঁতভাবে ছবি এঁকেছে, কোন ত্রুটি করেনি। কেননা হাজার হাজার বছর পূর্বের গুহা চিত্রে আজও তার উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. আদিম মানুষ ছবি আঁকার জন্য কি ব্যবহার করতো?
   ক. কাগজ
   খ. গুহার দেয়াল
   গ. ক্যানভাস
   ঘ. মেঝে।

২. গুহা চিত্রের প্রথম কোথায় সন্ধান পাওয়া যায়?
   ক. স্তেনে
   খ. আমেরিকায়
   গ. ইন্দোনেশিয়ায়
   ঘ. আফ্রিকায়।

৩. আদিম মানুষের ছবি আঁকার বিষয় কি ছিল?
   ক. আকাশ ও নদী
   খ. গাছ-পালা
   গ. পশু শিকার
   ঘ. ফুল-ফল-পাখি।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সবচে' পুরানো ছবি কোনটিকে বলা হয়? সেই ছবি এবং শিল্পীদের সম্পর্কে লিখুন।
২. আদিম মানুষেরা কোথায় ছবি আঁকতো? কেন আঁকতো তাদের আঁকা ছবির বর্ণনা দিন।

পাঠ ১.৪

ইউরোপ ও বাংলাদেশের কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ইউরোপ ও বাংলাদেশের বিখ্যাত শিল্পীদের পরিচিতির বর্ণনা দিতে পারবেন;
- পৃথিবীর উন্নতির বিকাশে শিল্পীদের অবদানের কথা উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের শিল্পীদের দেশের প্রতি ধ্যান ধারণা ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের চমকপ্রদ ঘটনা বিবৃত করতে পারবেন।

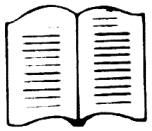

এই পাঠে আমরা আলোচনা করবো ইউরোপীয় বিখ্যাত কয়েকজন শিল্পীর জীবনী। আমরা লক্ষ্য করেছি সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে বিশ্বে শিল্পকলারও নানাবিধ বিস্তার-প্রসার ও বিকাশ লাভ করে, যা কিনা ইউরোপ থেকে গোড়াপত্তন হয়।

আদিম মানুষের গুহা চিত্র বিষয়ে সামান্য ধারণা আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি। এবার আমরা ইউরোপের বিখ্যাত কয়েকজন শিল্পীদের নাম ও কিছুটা পরিচিতি জানবো।

পন্ডিত ও বিশেষজ্ঞরা শিল্পকলা বিষয়ের বই লিখেছেন, গবেষণা করেছেন। রচিত হয়েছে বহু গ্রন্থ। উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে পৃথিবীর অসংখ্য ছোট বড় যাদুঘরে সংগ্রহশালায় ও চিত্রশালায়। একজন মানুষের পক্ষে এই বিশাল শিল্প সম্ভার ও নানাবিধ গ্রন্থ সমূহ দেখা ও পড়া সম্ভব নয়। এর মধ্যেও কিছু কিছু লোক চেষ্টা করেন তার মনের সাধ মেটাতে। তাই শিল্পকর্ম দেখেন এবং শিল্পকলা বিষয়ক বই পড়েন।

পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশে চৌদ্দ শতক থেকে শুরু করে উনিশ শতক পর্যন্ত শিল্পকলার বিরাট জাগরণ ঘটেছে। যাকে বলা হয় **রেঁনেসা**। সারা বিশ্বের বেশির ভাগ বিখ্যাত শিল্পকর্ম সৃষ্টি হয়েছে এ ছয়শত বছরে। পৃথিবীর বিখ্যাত যাদুঘর ও চিত্রশালায় এগুলো সাজানো রয়েছে। বহু দর্শক প্রতিদিন তা আজও উপভোগ করছে।

ইউরোপীয় শিল্পী পরিচিতি

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

জন্ম: ১৪৫২ সালে ইটালীতে। মৃত্যু ঃ ১৫১৯ সালে ফ্রান্সে। বয়স ঃ ৬৭ বছর।

ছোট বেলা কাটে ভিন্‌চি গ্রামে। তারপর ফ্লোরেন্সে। নিওনার্দো দা ভিঞ্চি দশ বৎসর চিত্রকলার শিক্ষা গ্রহণ করেন সে সময়ের ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ভেরেচিত্তর কাছে। এই সময়ে দা ভিঞ্চি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তার গুরুর চাইতেও ভাল ছবি আঁকেন। গুরু এই গুণী শিল্পীর প্রশংসা করে বেড়াতেন। পরবর্তীতে ১৬ বছর কাটান মিলান শহরে। এখানেই তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলো আঁকেন। যার ফলে সারা বিশ্বে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি শুধু চিত্রশিল্পীই ছিলেন না তিনি চিত্রশিল্পীর পাশাপাশি ভাস্কর, বিজ্ঞানী, কবি, গণিতজ্ঞ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও শরীর বিদ্যায় ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। তাই তাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলা হয়। তার আঁকা পৃথিবীর বিখ্যাত চিত্রকর্মের নাম মোনালিসা। ছবিটি তেল রঙে আঁকা ইতালীয়াল একজন মহিলার। ফ্রান্সের ল্যুভর মিউজিয়ামে ছবিটি সংগৃহীত আছে। তার আরেকটি শ্রেষ্ঠতম চিত্রের নাম 'লাস্ট সাপার' বা শেষ ভোজন। এই ছবিটিতে যীশুখৃস্ট তার বারোজন শিষ্যসহ খাবার টেবিল ঘিরে রয়েছে। যীশু বলছেন তোমাদের মধ্যে থেকেই একজন আমাকে ধরিয়ে দিবে। ভয়ে আতঙ্কগ্রস্থ শিষ্যদের মুখ। ছবিটি গীর্জার দেয়ালে আঁকা হয়েছে।

মাইকেল অ্যাঞ্জেলো

জন্ম: ১৪৭৫ সালে ইটালীতে। মৃত্যু: ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে। বয়স: ৮৯ বছর।

ধনী পরিবারে মিকেলান্‌জেলোর জন্ম। চিত্রশিল্পে আগ্রহ দেখে বাবা-মা তাঁকে পাঠান ফ্লোরেন্সে। নামকরা শিল্পী ডমেনিকো পিয়ারলান্দোর কাছে। মাত্র সাড়ে তিন বছরে গুরুর চেয়ে সুন্দর ছবি আঁকা ও ভাস্কর্য গড়ে তুলে সুনাম অর্জন করেছিলেন। ছাত্র যাতে গুরুকে ছেড়ে না যায় তার জন্য উল্টো ছাত্রকেই মাইনে দিত গুরু। পনের বছর বয়সে অপূর্ব সুন্দর শ্বেত পাথরের কিউপিডের ভাস্কর্য সৃষ্টি করেন। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো মাত্র ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যেই অনেক সুন্দর ও নিখুঁত ভাস্কর্য গড়ে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। এ্যাবড়ো থ্যাবরো অমসৃণ পাথর দিয়ে দু'বছর পরিশ্রম করে তৈরি করলেন এক অপূর্ব সুন্দর ভাস্কর্য, ডেভিডের মূর্তি। যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাস্কর্যের মধ্যে অন্যতম।

সিস্তিন গির্জার ভেতরের ছাঁদে ছবি এঁকে তার সুখ্যাতি রোমের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল। ১০ হাজার বর্গফুট জায়গায় চিত হয়ে শুয়ে ছবি আঁকতে হয়েছে সাড়ে চার বছর। তাতে তার পিঠ কুঁজো হয়ে গিয়েছিল। ছবিতে ৩৪৩টি মানব-মানবী ও দেবদূতের নিখুঁত ছবি আঁকা রীতিমত বিস্ময়কর। ছবি দেখে পোপ, অন্যান্য কর্মকর্তারা এবং রোমের মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত। ছবি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে, ভাবছে কী শক্তিশালী ও দক্ষ শিল্পী মহাপুরুষ মাইকেল অ্যাঞ্জেলো। কবি হিসেবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা অবনত হয়ে আসে।

র‍্যাফেল

জন্ম: ১৪৮৩ সালে ইটালীর উর্বিনোতে। মৃত্যু: ১৫২০ সালে। বয়স: ৩৭ বছর।

ঊনিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিখ্যাত শিল্পী পিরু জীনোর কাছে ছবি আঁকার হাতে খড়ি। র‍্যাফেল অনেক বিষয় নিয়ে ছবি এঁকেছেন। তার মধ্যে পৃথিবী খ্যাত 'ম্যাডেনা'র ছবি তাঁকে অমর করে রেখেছে। এরকম বয়সে ম্যাডেনা বিষয়ক এতো অপূর্ব সৃষ্টি আর কেউ করতে পারেনি। তার বিখ্যাত কিছু ম্যাডেনার নাম 'ম্যাডেনা অব দি গ্রান্ড ডিউক', 'ম্যাডেনা কাডিলিনা', ম্যাডেনা ডি সান সিস্টা'।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ও র‍্যাফেল তিনজনই একই সময়কার শিল্পী। তিনজনই তাদের শিল্পকর্মের জন্য ইউরোপ তথা পৃথিবী বিখ্যাত। তিনজনেই জন্মগ্রহণ করেন ইটালীতে। এটাও পৃথিবীতে একটা বিস্ময়কর ঘটনা।

রেমব্রান্ট

জন্ম: ১৬০৬। মৃত্যু: ১৬৬৯। বয়স: ৬৩ বছর।

ওলন্দাজ শিল্পী রেমব্রান্ট এর খ্যাতি লিওনার্দো মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ও র‍্যাফেল -এর মত। রেমব্রান্টের ছবির বৈশিষ্ট হল - আলো ও আধারের পরিবেশ তিনি খুব সুন্দরভাবে ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর বিখ্যাত ছবির নাম - রাতের পাহারা, পাখা হাতে মহিলা স্নানরতা রমণী। রেমব্রান্ট নিজের প্রতিকৃতি ও স্ত্রীর প্রতিকৃতি সুন্দরভাবে এঁকেছেন। ওলন্দাজের আরো বিখ্যাত শিল্পীদের নাম - ফ্রাঞ্জ হ্যাল্স, ভারমিয়ার প্রমুখ।

পিকাসো

জন্ম: ১৮৮১। মৃত্যু: ১৯৭৩। বয়স: ৯২ বছর।

নতুন নিয়ম- কানুন ও অনেক বিখ্যাত শিল্পীর আবির্ভাব হয় এই সময়ে। তবে ঊনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে পাবলো পিকাসোর নাম সর্বাধিক পরিচিত। স্তেনের মালাগাতে ১৮৮১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কিউবিজম নিয়মে তিনি অনেক ছবি এঁকেছেন। পিকাসোকে কিউবিজম এর সার্থক শিল্পী বলা হয়। তিনি ছিলেন মানব দরদী। তাঁর ছবিতে মানুষের দুঃখ, কষ্ট, বেদনার কথা ফুটে উঠত। তাই তাকে মানবতাবাদী শিল্পীও বলা হয়।

স্তেনের যুদ্ধবাজ অত্যাচারী শাসক ফ্রানকো স্তেনের গৃহযুদ্ধের সময় বোমারু বিমান দিয়ে বোমা ফেলে নির্মমভাবে ধ্বংস করে দেয় গোয়েনির্কা শহর। তার হৃদয়ে আলোড়ন তোলে এই অত্যাচার। তাই শিল্পী রাগে দুঃকে ক্ষোভে ঘৃণায় অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ছবি আঁকেন। ছবির নাম দেন গোয়ার্নিকা। অত্যাচারী শাসকের কারণেই শিল্পী স্তেন ত্যাগ করে প্যারিসে বসবাস করেন। দীর্ঘদিন তিনি বেঁচে ছিলেন।

বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ শিল্পী সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেন। এঁরা হলেন -উইলিয়াম হোগার্ত, উইলিয়াম ব্লেক, রিচার্ড উইলস্ন, জন কনস্টেবল, টার্নার প্রমুখ। এঁদের মধ্যে জন কনস্টেবল প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন- পাহাড়, বন, মাঠ, সূর্য উঠা, চাঁদের আলো, আকাশ, মেঘ ইত্যাদি খুবই

সুন্দরভাবে বাস্তবতার নিরিখে এঁকেছেন। টার্নারকে বলা হয় প্রকৃতির শিল্পী। তিনি সমুদ্র ঝড়, আকাশ, মেঘ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত সফলভাবে এঁকেছেন।

ইটালীতে যারা বিখ্যাত ছিলেন এঁরা হলেন- ভেনিসের তিশান, করেজজো, তিন্তোরিত্তো প্রমুখ। একই সময়ে ফ্লোমিশ শিল্পী, হুবার্ট ও ইয়ানভান আইক, এঁরা দুই ভাই ছিলেন তেল রঙের আবিষ্কারক। এঁরা অক্সাইড রঙ এর সাথে তিশিতেল ও বার্নিশ মিশিয়ে তেল রঙ তৈরি করতেন।

স্তেনের নামকরা শিল্পীরা হলেন - এলগ্রেকো, ভেলাসকেথ মুরীল্লো, গোইয়া প্রমুখ। এলগ্রেকোর ছবির বৈশিষ্ট্য হল ছবির মানুষ গাছপালা, ঘরবাড়ি, সবই লম্বাটে করে আঁকা। আর মুরীল্লোর ছবির এতো বেশি বাস্তব যে, আঁকা ছবির কুকুর দেখে বাস্তবের কুকুররা ঘেউ ঘেউ করে তাড়াতে আসতো।

নতুন নতুন শিল্প চিন্তা, মতবাদ, অংকন পদ্ধতির প্রসার, অভিনব নিয়ম-কানুনের প্রবর্তন শুরু হয় আঠার শতকের মাঝামাঝি থেকে। এই নিয়ম-কানুনগুলো বিভিন্ন নামে অভিহিত। যেমন- ইমপ্রেশনিজম, পোস্ট ইমপ্রেশনিজম, ফবিজম, কিউবিজম, নিসথেসিজম, দাদাইজম, একসপ্রেশনিজম, ফিউচারইজম, সুররিয়ালিজম ও এব্স্টাক্ট আর্ট (বিমূর্ত চিত্র)।

বাংলাদেশের শিল্পী পরিচিতি

বাংলাদেশে এখন অনেক চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর। এখানে সবার কথা বলা সম্ভব নয়। কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর কথা আলোচনা করা হল:

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

জন্ম: ১৯১৪ সালের ২৯ শে নভেম্বর, মৃত্যু: ১৯৭৬ সালের ২৮শে মে।

ময়মনসিংহ শহরের মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়াকালীন ভারতের এক শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করে জীবনের প্রথম কৃতিত্ব অর্জন করেন। স্কুলের পড়ালেখার পাঠ শেষ করে জয়নুল আবেদিন কলিকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। আর্ট স্কুলের শেষ বর্ষে অধ্যয়ন কালে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন।

১৯৩৩ সালে ফাইন আর্ট বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন এবং গভর্নরের স্বর্ণপদক লাভ করে সর্বভারতীয় শিল্পী হিসেবে সম্মানিত হন।

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকার জন্য সারা পৃথিবীতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৪৩ সালে (বাংলা ১৩৫০ সাল যা পঞ্চাশের মনন্তর নামে পরিচিত) তৎকালীন বৃটিশ শাসকদের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মৃত্যুবরণ করে। মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে তিনি বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৪৮ সালে অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর ঢাকায় চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন এবং তিনি তার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদেন।

১৯৫১ সালে জয়নুল আবেদিন বৃটিশ সরকারের আমন্ত্রণে ইংল্যান্ড গমন করেন। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক চিত্র সমালোচক ও শিক্ষক এরিক নিউটন জয়নুল আবেদিনের ছবি দেখে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন– "They are brilliant drawing done at white heat under the immediate spur of visible tragedy." এতেই প্রতীয়মান হয় যে তিনি কত বড় মাপের শিল্পী ছিলেন।

চিত্র শিল্পের অবদানের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাঁকে বহু সম্মান ও খেতাবে ভূষিত করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২/৩ টি উল্লেখ করা হল।

১৯৫৯ সালে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সম্মানিত মর্যাদায় (প্রাইড অব পারফরমেন্স) ভূষিত হয়ে "হেলাল-ই-ইমতিয়াজ" খেতাব লাভ করেন।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে সম্মানিত করেন।

১৯৭৬ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন।

দেশে জাতীয় যাদুঘর, ময়মনসিংহ জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যাদুঘরসহ বিশ্বের সকল ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় তাঁর শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে।

জীবনের শেষ দিকে কারু শিল্পের ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত সোনারগাঁওতে লোকশিল্প যাদুঘর প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত সোনারগাঁও ও সংগ্রহশালা এ দুটো শব্দই তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়েছিল।

কামরুল হাসান

জন্ম: ২ ডিসেম্বর, ১৯২১ কোলকাতা। মৃত্যু: ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮ ঢাকায়। বয়স: ৬৭ বছর।

কোলকাতা আর্ট স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত ব্রতচারী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ব্রতচারী আন্দোলন হল- খাঁটি বাঙালি হিসেবে নিজকে তৈরি করা এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা। শিশু কিশোরদের তদ্রুপ খাঁটি বাঙালি হিসেবে গড়ে তোলার জস 'মুকুল ফৌজ' গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন মুকুল ফৌজের সর্বাধিনায়ক। শরীর চর্চায় ও তার সুনাম ছিল। সুন্দর দেহ ও সুস্বাস্থ্যের জন্য ১৯৪৫ সালে মিঃ বেঙল উপাধি ও পুরস্কার লাভ করেন।

কামরুল হাসান একমাত্র শিল্পী যিনি প্রতিদিনই ছবি আঁকতেন। ৫০ বছর শিল্পী জীবনে প্রায় এক লক্ষ ড্রইং করেছেন। এত বেশি ড্রইং পৃথিবীতে কম শিল্পীই করেছেন। ড্রইং এ তার দক্ষথা তুলনাহীন।

কামরুলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ ১৯৭১ -এ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের জানোয়ারের মত মুখ অংকন। এটি একটি পোস্টার চিত্র। যার মধ্যে লেখা ছিল 'এই জানোয়ারদের রুখতে হবে'। এরা মানুষ হত্যা করে, আসুন আমরা পশু হত্যা করি। তার এই একটি পোস্টার চিত্র কাজ করেছে লক্ষ লক্ষ মেশিনগানের মতো। মুক্তিযুদ্ধের জন্য এটা ছিল উৎসাহ ও প্রেরণার মন্ত্র।

কামরুল হাসান তার ছবি আঁকা, লেখা, বক্তৃতা অর্থাৎ সবরকম কাজের মধ্যে দিয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন।

কামরুল হাসান নিজকে 'পটুয়া' বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। তার একান্ত প্রচেষ্টয় গ্রাম-বাংলার হস্তশিল্প বিকাশের জন্য গড়ে তোলেন নক্সা কেন্দ্র। যা জাতীয় নক্সা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা তার স্বপ্ন ছিল। বর্তমানে তা বিসিকের আওতাধীন। এই নক্সা কেন্দ্র থেকে ঐতিহ্যবাহী নক্সার নবরূপ দিয়ে দেশের কারুশিল্পকে সমৃদ্ধ করে যাচ্ছে।

তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলো হল- নবান্ন, উকি দেয়া, বাংলার রূপ, তিন কন্যা, জেলে, নায়র, পেঁচা, লাঠি খেলা, শিয়াল, বাংলাদেশের গণহত্যার আগে ও পরে। বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, নক্সা কেন্দ্র ও ব্যক্তিগত অনেক সংগ্রহ তাঁর ছবি রয়েছে।

আনোয়ারুল হক

জন্ম: আফ্রিকার উগান্ডায়। মৃত্যু: ১৯৮২ সালে ঢাকায়।

বাল্যকাল কাটে বাবার সাথে আফ্রিকার উগান্ডায়। পরবর্তীতে কোলকাতা আর্ট স্কুল থেকে শিল্পকলায় শিক্ষা লাভ করেন। তরুণ মেধাবী ছাত্র হিসেবে শিক্ষকতায় যোগদেন কোলকাতা আর্ট স্কুলে। জল রঙের ছবি আঁকায় আনোয়ারুল হক ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তেল রঙের তিনি কিছু ছবি এঁকেছেন। প্রতিটি ছাত্রকে তিনি হাতে ধরে শেখাতেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় জয়নুল আবেদীনের সাথে কাজ করেন। শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে তিনি কয়েকবার চারুকলা ইনস্টিটিউট এর অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক হিসেবে উক্ত প্রতিষ্ঠানেই আজীবন কাজ করে গেছেন।

এস এম সুলতান

জন্ম: ১৯২৩ সালে যশোহরের নাড়াইলে। মৃত্যু: ১৯৯৪ সালে নড়াইলে। বয়স: ৭১ বছর।

ছেলেবেলা কাটে গ্রামে। গ্রামের রূপ-রস-গন্ধ তাঁকে সারা জীবন আকর্ষণ করেছেন। ছবি আঁকা শেখেন কোলকাতা আর্ট স্কুলে। একজন খেয়ালী মানুষ হিসেবে তাঁর জুড়ি নেই। ঘুরে বেড়ান ভারত-পাকিস্তানের অনেক অঞ্চল। ছবি আঁকেন; প্রদর্শনী করেন। আবার ভব ঘুরে জীবন। উদ্দেশ্যহীন। ঘুরলেন ইউরোপ আমেরিকার অনেক দেশ। লম্বা চুল। কখনো কালো আলখেল্লা। কখনো গেরুয়া চাদর। কখনো মেয়েদের মতো শাড়ী-চুড়ি। বিচিত্র জীবনযাত্রা। সন্ন্যাসীর মত জীবন কাটিয়েছেন।

পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেও শিল্পীর মনের গহীনে সবসময় থেকেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের কৃষক। গ্রামীণ জীবন, ছেলে, চাষ-বাস, খেটে খাওয়া মানুষ ছিল তাঁর ছবির প্রধান বিষয়বস্তু। বাস্তব ধর্মী ছবি আঁকলেও ছবির মানুষেরা ছিল বলিষ্ঠ দেহ ও শক্তিশালী। তাঁর ছবির ব্যাখ্যায় তিনি বলতেন- কৃষক কুলের আমরা দেখি বাইরের রূপ। ভগ্ন স্বাস্থ্যে দুর্বল রুগ্ন শরীর। আসলে তো তা নয়। কেননা কৃষকেরা জমি চাষ করে, ফসল ফলায়, খাদ্য জোগায়। তাই তারাই দেশের শক্তি। তাদের ভেতরের রূপটা শক্তিশালী তেজস্বী। এ কারণেই সুলতানের ছবির মানুষগুলো ছিল বলিষ্ঠ পেশীবহুল ও শক্তিশালী।

এস এম সুলতান কৃষকের যেমন ভেতরের রূপটা অনুভব করেছিলেন। তেমনি শিশুদের নিয়ে ভাবতেন। শিশুদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষার স্কুল করেন। যেখানে শিশুরা প্রকৃতির সাথে মিশে গান গাইবে, ছবি আঁকবে, লেখাপড়া করবে। জীবজন্তুর সাথেও শিশুরা সখ্যতা গড়ে তুলবে। প্রকৃতির সব কিছুকে আপন করে নেবে শিশুরা। মিশে যাবে সব কিছুর সাথে, প্রকৃতির সাথে। জোর করে শিক্ষা নয়।

প্রকৃতির সাথে মিলে-মিশেই হবে শিক্ষা। প্রকৃতি থেকেই শিখবে শিশুরা অনেকঅনেক কিছু। সমস্ত প্রাণীকে ভালবাসবে। এই চিন্তা চেতনায় তিনি একটি স্কুল গড়েন। এই বিশেষ ধরনের স্কুলের নাম 'শিশু স্বর্গ'। শেষ বয়সে নড়াইলে তিনি শিশু স্বর্গের জন্য কাজ করে গেছেন।

পশু-পাখিকে আপন সন্তানের মতো যত্ন করতেন। অনেক পশু-পাখি তিনি পালতেন। তাঁর ছবিগুলো বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরসহ দেশ-বিদেশের অনেক সংগ্রহ শালায় তাঁর ছবি রয়েছে।

সফি উদ্দিন আহমেদ

কোলকাতা আর্ট স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলেত যান। ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্মলগ্ন থেকেই শিক্ষকতা করে আসছেন। ছাপচিত্রে বিশেষ করে কাঠ খোদাই, এচিং ও একোয়া প্রিন্ট এ তিনি একজ দক্ষ চিত্রশিল্পী। শিল্পী সফি উদ্দিন আহমেদ তেল রঙেও অনেক ছবি আঁকেন। তাঁর বিখ্যাত ছবির নাম- সাওতাল মেয়ে, গ্রামের পথ, নিসর্গ ইত্যাদি।

হামিদুর রহমান

পড়াশুনা করেছেন চারুকলা ইনস্টিটিউটে এবং দেশের বাইরেও উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম শহীদ মিনার। তাঁর সাথে শিল্পী নভেরা আহমেদ সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন।

এছাড়া বাংলাদেশের আরো অনেক বিখ্যাত শিল্পী রয়েছেন তাদের মধ্যে মোহাম্মদ কিবরিয়া, আবদুর রাজ্জাক, রশিদ চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম, মোস্তফা মনোয়ার, আবুল বাছেত, হাসেম খাঁন, রফিকুন নবী, মনিরুল ইসলাম, সাহাবুদ্দিন প্রমুখ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. লাস্ট সাফার লিওনার্দোর আঁকা কোন দৃশ্যের ছবি?
ক. প্রেমের দৃশ্য
খ. প্রাকৃতিক দৃশ্য
গ. যুদ্ধের দৃশ্য
ঘ. আতংকের দৃশ্য।

২. মোনালিসা ছবিটি কে এঁকেছেন?
ক. মাইকেল অ্যাঞ্জেলো
খ. রাফাইল
গ. লিওনার্দো দা ভিঞ্চি
ঘ. জন কনস্টাবেল।

৩. সিস্তিন গির্জার ছাদে ছবি এঁকেছেন-
ক. মাইকেল অ্যাঞ্জেলো
খ. রেমব্রান্ট
গ. টার্নার
ঘ. পাবলো পিকাসোখ

৪. পিকাসোর বিখ্যাত ছবির নাম কি?
ক. মোনালিসা
খ. গোয়ার্নিকা
গ. ম্যাডেনা কার্ডিলিনা
ঘ. লাস্ট সাফার।

৫. বাংলাদেশে প্রথম স্থপতি আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রধান এবং প্রথম অধ্যক্ষ কে?
ক. সফি উদ্দিন আহমেদ
খ. কামরুল হাসান
গ. জয়নুল আবেদিন
ঘ. আনোয়ারুল হক।

৬. বাংলাদেশের বিখ্যাত লোকশিল্পের উদাহরণ কি?
ক. জয়নুলের আঁকা ছবি
খ. নক্সী কাঁথা
গ. বইয়ের ছবি
ঘ. তৈলচিত্র।

৭. এস এম সুলতান ছিলেন-
ক. গায়ক
খ. চিত্রশিল্পী
গ. বাউল
ঘ. লেখক।

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. তিনি একজন চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, বিজ্ঞানী, কবি, গণিত শাস্ত্রে পন্ডিত, ইঞ্জিনিয়ারিং ও শরীর বিদ্যায় পারদর্শী। কে তিনি? তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. মাইকেল অ্যাঞ্জেলো সম্পর্কে লিখুন।
৩. পাবলো পিকাসোর বিখ্যাত ছবির নাম কি? সেই ছবি এবং শিল্পী সম্পর্কে লিখুন।
৪. জয়নুল আবেদিনের জীবনের উপর সংক্ষিপ্তভাবে লিখুন।
৫. কামরুল হাসানের বিখ্যাত পোস্টার চিত্র কি ছিল? তাঁর জীবনী নিয়ে সংক্ষিপ্ত লিখুন।
৬. আপনার প্রিয় শিল্পীর বিষয়ে লিখুন।